প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

লোককবি বিজয় সরকারের সমাজ চেতনা

হীরামন পোদ্দার
গবেষক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা

Abstract

Now a days, Communal disharmony and self-centered pragmatic attitude is not only destroying our society and culture but also our existence. Refine culture, communal harmony and fellow feeling humanity can build up a prosperous world. Lokokabi Bijoy sarkar is a glowing illustration who dedicated his life to uphold a prosperous world based upon universal brotherhood. His immortal songs have shown the ways to solve the differences of caste, creed and nationality along with superstitions. He deeply realized that human peace and welfare of human beings could be possible through the worship humanity. He dreamt of a pure society, there would be no divisions among Hindu, Mohamadans, Boudhists, Christians and haves and have-nots. From the vast experiences of his life, he realized that the meaninglessness of differences among human beings. Therefore, he tried heart and soul to save all which were really good and welfare for the human beings. He felt profoundly that to serve man is to serve God. He forbade people to look down upon other because its sin. In a nutshell, in the changing condition of society, lokokabi Bijoy sarkar's unparalleled invaluable writings are glowing example to all of us.

মানুষ সামাজিক জীব। মিলে মিশে একসাথে বসবাস করার মধ্য দিয়েই মানুষ তার সমাজ গড়ে তোলে। মানব সমাজ একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু যুগ ধরে স্তরে স্তরে তা গঠিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। গ্রীক পন্ডিত অ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্স' (Politics) গ্রন্থে আছে তাঁর গভীর উপলব্ধির কথা – "Man is by nature a social animals; an individual who is unsocial naturally and not accidentally is either beneath our notice or more than human"[১]

গতিশীলতাই মানবজীবন এবং মানবসমাজের বিশেষত্ব। সর্বদাই এর বিবর্তন ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে মানুষ অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলে। নিয়ম-কানুনের বিশেষ উন্নত রূপ হল : রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। তবে সমাজের একটি সঠিক ও সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' অনুযায়ী 'সমাজ' শব্দের অর্থ – 'পরস্পরের সহযোগিতায় অবস্থানকারী মনুষ্য-সঙ্ঘ।'[২] সহযোগিতা ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। সমাজবদ্ধতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সমাজের মধ্যে জীবনযাপনের মাধ্যমেই ব্যক্তির আত্মা-স্বাতন্ত্রবোধ বা চেতনা জাগ্রত হয়। এক্ষেত্রে ম্যাকাইভার ও পেজের মত হল :

> Social beings, men, express their nature by creating and re-creating and organization which guides and controls their behavior in myriad ways".[৩]

সঙ্গীতের সঙ্গে এই সমাজের একটা গাঁট-ছড়া বাঁধা আছে এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে মোটামুটি তাল রেখেই সঙ্গীতেরও পরিবর্তন এবং বিকাশ ঘটে – এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। কেউ কেউ আবার মনে করেন সঙ্গীত সমাজের প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে এই আপাত সত্যের চেয়ে আরও বড় সত্য হল : যাকে আমরা 'ব্যক্তি মানস' বলে অভিহিত করি সেই খোদ ব্যক্তি মানসটাই সমাজের সৃষ্টি। সুতরাং সমাজ থেকেই সঙ্গীতের উদ্ভব ঘটেছে এবং উদ্ভুত হবার পর আবার সেই সঙ্গীত সমাজকেই প্রাভাবিত করে। ফসল ফলানোর সামাজিক তাগিদেই ফসল ফলানোর সঙ্গীত-নৃত্যের উদ্ভব আবার এই সঙ্গীত-নৃত্যেই মানুষের ফসল গলানোর বাস্তব কর্মে প্রেরণা দিচ্ছে। বস্তুগত সমাজের সঙ্গে সঙ্গীতের এই নিবিড় সম্পর্ক থাকার জন্য সমাজের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও কমবেশি পরিবর্তন ঘটে। আদিম যুগের তুলনায় বৈদিক যুগে যে সঙ্গীতের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল তার কারণ নিহিত আছে ঐ সমাজ পরিবর্তনের মধ্যে। এ সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন --"সঙ্গীতের ইতিহাস বিবর্তনময় সমাজের প্রভাব পড়া কিছু অস্বাভাবিক নয়, বরং স্বাভাবিক।"[৪] --বাস্তব সমাজের সঙ্গে সঙ্গীত যতক্ষণ নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত থাকে ততক্ষণ সঙ্গীত জীবন্ত এবং গতিময় থাকে, আর বাস্তব সমাজ থেকে কোনও কারণে যদি সঙ্গীত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তবে তার অবস্থাটা অনেকটাই গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা ফুলের মতোই হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে সুসজ্জিত গৃহে ফুলদানির সামগ্রী হয়ে কিছু রসিক অভ্যাগতের প্রশংসা হয়তো কুড়াতে পারে কিন্তু অরণ্যের সঙ্গে তার নাড়ীর বিচ্ছেদ, তাকে প্রাণহীন করে তোলে। শিল্পের ইতিহাস বারবার একথা প্রমাণ করেছে স্বদেশে এবং বিদেশে সর্বত্রই। রবীন্দ্রনাথও ঘোষণা করেছেন ---

> "সঙ্গীতের এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ও তাহার উপরেসমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়।"[৫]

কবিগান বাংলা সমাজ সংস্কৃতির একটি বলিষ্ট ধারা। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সংস্কৃতির এই বলিষ্ট সজীব ধারা নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। কবিগণ লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে, কবিগণ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল তা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ ১৩০২ বঙ্গাব্দে 'কবিসঙ্গীত' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। উক্ত প্রবন্ধটি তার 'লোকসাহিত্য' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে কবি বলেছেন ---

> " ... ... কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের একটি অঙ্গ ... ... আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজন সভার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথ প্রদর্শক।"[৬]

কবিগানে বর্ণিত সমাজ এই বাংলার। কবিগানে বর্ণিত লোকাচার, সাধন-পদ্ধতি লোকায়ত মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি, সমাজ প্রভৃতি সকলই বাংলার, সম-সাময়িক সমাজ-কৃষ্টি ধর্ম প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বস্তুত সাহিত্যের মহৎ উদ্দেশ্য শুধু কল্পনা বিলাসী হয়ে অবাস্তব রূপ মাধুর্য ভোগ নয়। সাহিত্য শুধু বাস্তবকে এড়িয়ে কল্পনা বিলাস নয়। সততা রক্ষা অর্থাৎ সত্যভাষণ সৎ সাহিত্যের প্রাণ।

তবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য যে উক্ত উদ্দেশ্য যদি কেউ অষ্টাদশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক কবিগানের কোন সংকলন নিয়ে অনুসন্ধান করেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি বিভ্রান্ত বোধ করবেন। অষ্টাদশ শতকের কবিওয়ালাদের প্রসঙ্গে প্রবীণ গবেষক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) বলেছেন ---

> "... ... সেদিনের যাহারা কবি তাহারা দুঃখের দিনের-দুর্দিনের কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সে দুঃখের ছায়াও কাহারও কবিতাকে স্পর্শ করে নাই। ... ... অবসাদপঙ্কে আকণ্ঠমগ্ন জাতি-হৃদয় অনুভূতিহীন, দেহ স্পর্শবোধশূন্য, অন্ধতন্দ্রাহতের মত পড়িয়া রহিল। কেহ হাহাকার করিল না, কেহ এক বিন্দু চোখের জল ফেলিল না, সকল দুঃখ সকল অপমান এমনভাবে মাথা পাতিয়া সহ্য করিল, যেন ইহাই তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য ছিল। সুতরাং কবিওয়ালাগণকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না।"[৭]

--- বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্বের গোজলা গুঁই (১৭০০-১৭৬০) দ্বিতীয়ার্ধের রাসু রায় (১৭৩৫-১৮০৭), নৃসিংহ রায় (১৭৩৮-১৮০৯), হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮২৮), বলহরি রায় (১৭৪৩-১৮৪৯), নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১) কিংবা উনিশ শতকের রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮), নীলমণি ঠাকুর (১৭৪৪-১৮২৫) - কারো গানে সমাজ জীবনের স্পষ্ট-অস্পষ্ট কোন প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করাই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ভবানী-বিষয়, সখী-সংবাদ, মান, বিরহ, কলঙ্ক, মাথুর ইত্যাদি কতকগুলি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয় ও অধ্যায় নিয়ে কবিগান রচনা করার রেওয়াজও বোধ হয় তার একটি কারণ। বহু পুরানো ঐতিহ্যের অনুসরণ করতে গিয়ে বাঁধাধরা বিষয়ের কাঠামোর মধ্যে কবি গায়করা নিজের নিজের যুগকে সরাসরি প্রতিফলিত করার সুযোগ পেতেন কদাচিৎই। এই ঐতিহ্যের বন্ধন যে কতদূর অলঙ্ঘনীয় ছিল, একজন সখের কবির উদাহরণই সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাবে। 'সেই যুগের বিশিষ্ট সমাজ সচেতন পত্রিকা 'মধ্যস্থ'র সম্পাদক ছিলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)। হিন্দু মেলায় দেওয়া তাঁর উদ্দীপক বক্তৃতাবলী ছিল সেকালে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী'।[৮] তাঁর অজস্র গানেও আছে সমাজ ও ইতিহাস সচেতনতার সুস্পষ্ট প্রকাশ। 'হরিশচন্দ্রের' মতন একটি পৌরাণিক নাটকের তিনি ট্যাক্স বা কর সংক্রান্ত গানের ভিতরে তখনকার করভার-পীড়িত সমাজের ছবি এঁকেছেন ---

"... দে কর দে কর রব নিরন্তর করের দায় অঙ্গ জর জর।
... আয় কর শুনে, গায়ে আসে জ্বর
... লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর।"[৯]

ঐ একই নাটকে আরেকটি গানে আছে পরাধীনতার গ্লানি:

"... দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ!
... ছুঁই সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিত; খেতে, শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"[১০]

--- অথচ ভাবতে অবাক লাগে 'হরিশচন্দ্র' নাটকে নিজের সময়কে এমনভাবে তুলে ধরতে পারেন যিনি সেই মনোমোহন বসুই কবিগানের নির্দিষ্ট Conventional বা প্রথাগত ছকের মধ্যে কেমন স্বাতন্ত্রহীন, অন্যরকম। সেখানে খেউড়ের অংশে শ-কার ব-কার শব্দ যুদ্ধেও তাঁর কিছুমাত্র অরুচিকর প্রমাণ মেলে না। মোটামুটি এই রকমই ছিল সে যুগের অধিকাংশ কবিগানের চেহারা। এর মধ্যে তৎকালীন সমাজকে খুঁজবার শ্রম পন্ডশ্রমে পর্যবসিত হবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধীরে ধীরে পরিবর্তন এলো কবিগানের চরিত্রে। আধুনিক কবিগানের গুরু হিসাবে যিনি পরিচিত, সেই হরিচরণ আচার্য (১৮৬১-১৯৪১) কবিগানের মধ্যেই প্রথম নতুন যুগের স্পর্শে পাওয়া গেল। রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রচলিত বিষয় নিয়ে কবিগান রচনা করলেও সমসাময়িক সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষের আশা-আখাঙ্কা, সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। এমনকি লহর-খেউড়ের অংশকেও তিনি অশ্লীলতামুক্ত করে তুলেছিলেন, সাধ্যমতন। সমাজের শোচনীয় দুরবস্থা,অনাচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট থেকে শুরু করে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারাবরণ ইত্যাদি অনেক কিছুই ছিল হরিচরণ আচার্যের গানের বিষয়। তিনি গেয়েছিলেন স্বদেশী ধারার গান :

"হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের সন্তান
একই সূত্রে গাঁথা
ভাইরে এক প্রাণে গাঁথা

উঠিল জয়ধ্বনি মেদিনী প্রকম্পিতা।"[১১]

--হরি আচার্য একা নন, তার পথ ধরে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে জেলায়-জেলায় কবিগানের পুরাতন স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছোট-বড় অসংখ্য কবিয়ালের শ্রম, সাধনায় তিলে তিলে গড়ে উঠতে লাগল নতুন ধরনের কবিগানের চরিত্র। মূল বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম সংক্রান্ত থেকে গেলেও তার আসর বন্দনায় কিংবা মালসি গানে প্রায়শঃই সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বা ঘটনার ছায়াপাত ঘটতে লাগল। এছাড়া হরিচরণ আচার্যের বয়ঃজ্যেষ্ঠ তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৫-১৯১৪) এর হাতেই সর্বপ্রথম ভাবসমৃদ্ধ, আবিলতাযুক্ত, সংযত কবিগানের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। কবিগান যে অশ্লীলতাদুষ্ট, ভদ্র-পরিবেশে উপস্থাপনের অযোগ্য সঙ্গীত এই অপবাদ তারকচন্দ্র সরকারের কবিসঙ্গীত থেকেই দেওয়া যেতে পারে।

এতকাল গ্রামীণ সংস্কৃতির এই মাধ্যমটিতে শাসক শ্রেণির দর্শনেরই ছিল প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত আঘাত এলো তারই উপর। সংঘবদ্ধ হতে লাগলেন কবিওয়ালারা। তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সমাজের সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে। লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যেমন মন্বন্তর বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে, তেমনি কবিগান তার ইতিহাসে এই প্রথম হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের বিশ্বস্ততম বন্ধু। শ্রীহট্টের কবিয়াল প্রসন্নকুমার চন্দ (বিশ শতক) বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা করলেন তাঁরগানে :

"ছিল ধন্য পুণ্য জন্মভূমি
মোদের সোনার বাংলাদেশ,
হায়রে দুর্ভিক্ষ অনশনে এ দেশে বর্তমানে,
হোল দুঃখ দুর্গতির একশেষ।"[১২]

বীরভূমের গোমানী দেওয়ান (১৮৯৫-১৯৭৬) গাইলেন সংগ্রামের গান :

"ভয় কিরে ভাই বঙ্গবাসী থাকতে তোদের এত বল,
দ্বার খুলে চল আগল ভেঙ্গে মোছ রে মায়ের নয়ন জল। ... ..."[১৩]

চট্টগ্রামের রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭) গাইলেন :

"দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখনো মানুষ জাগিল না কেনে?[১৪]

বরিশালের নকুলেশ্বর সরকার (১৮৯৪-১৯৮৭) গাইলেন :

"এবার জাগো ভারতবাসী
হয়ে সামর্থহীন পরের অধীন
আর কতদিন থাকবে বসি। ... ..."[১৫]

রাইগোপাল দাস (বিশ শতক) গাইলেন :

"এরূপ করে দেশের মানুষ কয় দিন বাঁচিবে
থর থর কাঁপে দেহ অন্নের অভাবে,
দুরন্ত দুর্ভিক্ষ এসে রক্ত মাংস নিল শুষে
কোথা যাব পায় না দিশে কে বা রাখিবে।"[১৬]

নারীমুক্তির জন্য লোককবিগণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'কৌলিন্যপ্রথা', 'পণপ্রথা' এবং 'বিধবা বিবাহ' - এই ধরণের সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে কবিগণ জনসাধারণকে সচেতন করে সমাজ প্রগতির পথ দেখিয়েছেন। কবি হরি আচার্যের বিধবা বিবাহ বিষয়ক একটি গানে আছে :

"যদি বিধবার বিবাহ হইত দূর হইত দেশের মনস্তাপ,
ঘুচত বিধবার বিলাপ।"[১৭]

কবিগানের সুদীর্ঘ ইতিহাসের এই প্রথম সমাজ ও ইতিহাস সচেতন একদল কবিদের গানের ভিতর মিলল সমকালীন সমাজের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। এঁদের উত্তরসূরী হিসাবে সমাজের অন্তর্নিহিত অন্ধকার দূর করার জন্য নিজেকে অন্তর্জ্যোতির আলোকে আলোকিত করেই আলো হাতে করে সমাজের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হলেন লোককবি বিজয় সরকার।

বাউল ও সমানধর্মা মরমি সাধকদের সম্পর্কে একটি ধারণা প্রচলিত আছে, এরা গূঢ়-গুহ্য রহস্যময় দেহকেন্দ্রিক সাধনার বলয়েই আবদ্ধ-সমাজ বা সমকাল সম্পর্কে এদের কোন আগ্রহ বা প্রতিক্রিয়া নেই। নিস্তরঙ্গ নদীর মতোই এদের জীবন। কিন্তু গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে এই সত্য আবিষ্কার করা যায়, এই সাধকেরা একই সঙ্গে মরমি ও দ্রোহী। বাউল, কবি ও সমধর্মী সাধকের গান তাই একদিকে দেহজরিপের গান, স্বরূপ-অণ্বেষার গান, 'গভীর নির্জন পথে' 'মনের মানুষ'কে খুঁজে ফেরারগান - অপরদিকে এই গান নিম্নবর্গের মানুষের দ্রোহের গান-প্রতিবাদের গান-শ্রেণিচেতনার গান-শুভ্র সুন্দর জীবনস্বপ্নের গানও। বর্ণশোষণ ও জাতপাতের বিপক্ষে জাত-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে মানুষ ভজনাই তার দর্শনের সার। রূপক প্রতিকের আড়াল মেনে যে গান মরমি মহাজন বাঁধেন, অনেক সময় বাইরের দিক দিয়ে দেখলে তাকে নিরীহ ও সম্মোহিত সাধকের ভজনার গীত বলেই মনে হবে, কিন্তু সামাজিক নিগ্রহ-ধর্মীয় বঞ্চনা-মানবিক লাঞ্ছনার চালচিত্রও এই গান তার সতর্ক বীক্ষণে ধরা পড়ে। কালিক সমস্যা ও যুগযন্ত্রণা স্পর্শ করে বলেই তার গান হয়ে ওঠে একই সঙ্গে মরমি ও দ্রোহীর জীবন রাগিণীর যুগলবন্দি। সামাজিক সম্পর্ক যতই না শিথিল হোক, সমকালীর ঘটনার প্রতিক্রিয়া নির্মোহ-নির্লিপ্ত গ্রামীণ সাধক ও মরমি লোক কবির জীবনকেও করে তোলে চঞ্চল-বিচলিত, তাঁর নিথর মনের নদীও তখন হয়ে ওঠে ঊর্মিমুখর।

অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে প্রায় আটশো বছরের সাহিত্যিক পরম্পরা আছে বাংলার। সেইসব সাহিত্যের পরিমাণ ও গুণগত মান খুব যে উপেক্ষণীয় এমনটাও বলা যাবে না। সাধারণভাবে, কোন জাতির ইতিহাস কোন বিশেষ কালে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিলেও পুরানোকালের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন করে ফেলে না। বরং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরানো নতুনকে কখনো না কখনো প্রাভাবিত করে। জন অ্যাডিংটন সাইমন্ডস দ্বারা প্রাভাবিত হয়ে শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন ---

> "রেনেসাঁস হচ্ছে মানব সভ্যতার প্রথম বসন্ত। বসন্ত এলে প্রকৃতি যেমন সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে চায়, গাছ থেকে ঝরে যায় পুরানো পাতা, কচি কচি পাতার পাঁজর ফাটিয়ে সে হাসতে থাকে, রেনেসাঁসেও ঘটে একই ব্যাপার"[১৮]

প্রত্যেক জাতির একই নিজস্ব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই নিরিখেই সে বেছে নেয় তার আত্মপ্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম। ইতালীয় রেনেসাঁসে যেমন চিত্রকলা, বঙ্গীয় নবজাগরণে তেমনি সাহিত্য। লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da vinci), মাইকেল্যাঞ্জেলো (Michelangelo), ম্যাসাকিও (Massaccio), গ্যত্তো (Giotto), রাফায়েল (Raphael) প্রমুখেরা তাঁদের রঙ তুলি দিয়ে ফুটিয়েছিলেন ইতালীয় রেনেসাঁসের ফুল। বাংলার ক্ষেত্রে এই বাসন্তিক সংরচনাকর্মে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - এঁদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকে কেন্দ্র করে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) নেতৃত্বে নবজাগরণ ঘটে। এই নবজাগরণে ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন ও নিউ হিন্দু মুভ্‌মেন্টের যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল তা অনস্বীকার্য। তবে এই আন্দোলন ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে এই জাগরণের জন্ম। কিন্তু সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সর্বজনীন মানব-চেতনাকে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়নি এই নবজাগৃতি। আধুনিক শিক্ষার আলোকবঞ্চিত বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে এর কোনও যোগ ছিল না। তাই এই জাগরণ মিলিত হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত প্রয়াসে সফল নয়; বা এর পরিণামফল হিসাবে হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি গ্রামের অন্ত্যজ অবহেলিত মানুষের জীবনে এই শহর কেন্দ্রিক রেনেসাঁস কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি, তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। রেনেসাঁসদীপ্ত বাঙালির সাহিত্য প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাংলার গ্রামদেশেও নীরবে-নিভৃতে

চলছিল জাগৃতির প্রয়াস। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে অন্ত্যজ সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) এবং শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭)। তাঁদের প্রচেষ্টায় মতুয়া ধর্মান্দোলনের মাধ্যমে পূর্বভারতে তথা বঙ্গদেশে অন্ত্যজ মানুষের নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। এই নবজাগরণ ছিল সর্বব্যাপী। কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণের কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। মাতুয়া আন্দোলনের মাধ্যমে অন্ত্যজ মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসার, সমাজ সংস্কার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, চাকরীর আন্দোলন প্রভৃতি সংঘটিত হয়।

রামমোহন (১৭৭২/৭৪-১৮৩৩) প্রবর্তিত কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণে মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ কবি সাহিত্যিক, দার্শনিকগণ যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, অনেকটা সেই ভূমিকা পালন করেছিলেন – লোককবি ও অন্যান্য কবি সাহিত্যিক দার্শনিকগণ। কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৫-১৯১৪), হরিবর সরকার (১৮৭৯-১৯৩৯), মনোহর সরকার (১৮৭৯-১৯৩৯), রাজেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৯২-১৯৭৪), আচার্য মহানন্দ হালদার (১৩০৯-১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), অশ্বিনী সরকার (১৮৭৭-১৯২৯), কবি বিজয় সরকার (১৯০৩-১৯৮৫), নিশিকান্ত সরকার (১৯১৩-১৯৯৩) প্রমুখ কবির সাধনা ও গানে উঠে এসেছিল গ্রামবাংলার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনতীর্থ। এই প্রসঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের অবদানও অপরিসীম। এই লোককবিগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার আসরে গান পরিবেশন করেছেন এবং শ্রোতাদের নতুন আদর্শে দীক্ষিত করেছেন। নবজাগৃতির অন্যতম শর্ত যে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদ তা এই অশিক্ষিত গ্রাম্য সাধকদের বাণী ও সাধনার ভিতরেই সত্য হয়ে উঠেছিল – প্রাণ পেয়েছিল। গ্রাম বাংলার এই মানবতাবাদী মুক্তবাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন – লোককবি বিজয় সরকার।

সবকাল-সবযুগেই একদল মানুষ শাস্ত্রাচারের গন্ডির বাইরে মানবমুক্তি ও ঈশ্বরলাভের পথ খুঁজছেন। জাত-কুল-সম্প্রদায়কে তাঁরা দূরে সরিয়ে ধর্মকে হৃদয়ের সহজ সত্যের আলোকে চিনতে চেষ্টা করেছেন। বিবাদ-বিভেদের পথে না গিয়ে তাঁরা সমন্বয়-মিলনের অভিনব বাণী প্রচার করেছেন, মানুষ নির্বিশেষে সবাইকে তাঁদের 'প্রীতি-প্রেম' বিলিয়েছেন। নীরস-কঠিন-প্রাণহীন শাস্ত্রকথাকে তাঁরা মর্মের সরসতায় সিক্ত করে পরিবেশন করেছেন। এই ধারায় গড়ে উঠেছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সন্তধর্ম ও ভক্তিধর্ম, অসমের মহাপুরুষদের মত, বাংলার বৈষ্ণব-বাউল-কবিগান ও ছোট-বড় আরও অনেক লৌকিক মতবাদ। এই ভাবে মরমি সাধনার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, তা শাস্ত্রশাসিত ধর্মান্ধ বৃহত্তর ভারতের মানবতাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, ও সম্প্রদায়-সম্প্রীতির ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। মন্দির-মসজিদের বাইরে তাঁরা মুক্তি খুঁজেছেন, যে মুক্তির পথ সর্বমানবের কল্যাণ ও ভালোবাসায় স্নাত। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও কলহ, জাতি-কুলগত বিভেদ ও বিরোধ, বর্ণ-শোষন, সামাজিক ও শ্রেণি-বৈষম্য, আচারসর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে এঁরা জাত-কুল-ধর্ম গোত্রের বিভেদ বর্জিত; সব সংস্কার মুক্ত মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক উদার ধর্ম-ধারণার জন্ম দেন। চরিত্র-বিচারে বাংলার কবিগান এবং লোককবি বিজয় সরকারের সাধনা-দর্শন-এই সব মরমি সম্প্রদায় ও সাধনার সমানধর্মা।

কবিগানের প্রবর্তনের পিছনে ধর্মজিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্মজ্ঞান অন্বেষণের পাশাপাশি সামাজিক শোষণ-অবিচার-বৈষম্য এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও জাতিভেদের মতো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব ছিল। এ কারণেই সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্য একটি উদার ধর্ম মতের সন্ধান অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। অরবিন্দ পোদ্দার এই ধর্মসাধনার পেক্ষাপট আলোচনা করে সঙ্গতভাবেই বলেছেন ---

> "সমাজের দাবী তাঁরা সম্পুর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ... এই প্রত্যাখ্যানের পশ্চাতে গভীর দুঃখবোধ, সামাজিক ভেদ-বিচারের নির্মম উৎপীড়ন বর্তমান ছিল, তা বলাই বাহুল্য।"[১৯]

--কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট ও দীক্ষা গ্রহণের পিছনে বিজয় সরকারের জীবনের মর্মস্পর্শী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

যে সমাজ জীবনের মধ্যে বিজয় সরকারের জন্ম, বেড়ে ওঠা-সেই সমাজের স্বাস্থ্য যে সুন্দর ছিল তা বলা যায় না। সেই সমাজ-দেহে নানা শুষ্কতা, শূন্যতা দৈন্যতা তথা নানা অসামজিকতা-অমানবিকতার ক্ষত ছিল। তিনি

সেই অনাদর মলিন সমাজ-দেহের নানা ক্ষত দূর করার জন্য নিজে সমাজ-চেতনাকে অপরিমান মনুষ্যত্বে বড়ো করতে সচেষ্ট হলেন সমাজের ভিতরকার অন্ধতম-অন্ধতর মূঢ়তাকে-মানবিকতার চেতন-চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করে অন্তরের মধ্যে শপথ গ্রহণ করলেন অনাদৃত-অন্ধকার সমাজ-জীবনের আবর্জনা যতটা দূর করা যায়। তিনি প্রতিপত্তির প্রলোভন ত্যাগ করে প্রায় সন্ন্যাসীর শূন্যতা নিয়ে সমাজের আনন্দলোক ফিরিয়ে আনবার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন এবং নিজেকে বলিষ্ট সাধনার জন্য নিয়ে আসলেন নিজেরই নির্জন নিকেতনে।

আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রেখে, সুখ্যাতি লাভের প্রলোভন ত্যাগ করে, অন্তরের অশান্ত যত্নে, অপ্রতিহত উদ্যমে, আত্মনিষ্ঠার উপর নির্ভর করে পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মানব-মাহাত্মের কাজ। বিজয় সরকার তাঁর আপনার জীনবকে এমন করে সমাজ-জীবনের মধ্যে দান করেছেন যে আমরা তাঁর দানের পরিমাপ করতে পারি না। তাঁর পণ ছিল যা জীবনে একেবারে খাটি তা-ই তিনি দেবেন-তার সঙ্গে নিজের ভালো-মন্দ, লাভ-লোকসান, পাপ-পুণ্য কিছুকে মেশাবেন না। লোককবি বিজয় সরকার বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর কবিগান এবং কবিগান নিরপেক্ষ ভাব সঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন। সমস্ত মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সমাজ জীবনের মধ্যে যা কিছু ভালো-যা কিছু সত্য-যা কিছু সুন্দর-যা কিছু শিব-যা কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাকেই তিনি একান্তে আগ্রহের সঙ্গে খুঁজেছেন সমাজ বিবেকের মহান ভূমিকায়। আপামর গ্রামীণ মানুষের হৃদয়ে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন জীবন ও জগতের মূল তত্ত্ব, যাতে সে তার জীবন যাপনে আদর্শ মানুষ হতে পারে, হতেপারে জীবন সচেতন। যেমন শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল, তেমনি বিজয় সরকারেরও সমাজের প্রতি সত্য প্রেম ছিল বলে তিনি অগ্নিতাপ সহ্য করে আপনার ভিতরকার বিজয়কে কঠিন সমস্যায় সমর্পণ করেছিলেন। দিনের পর দিন যদিও তপস্যার সেই কঠোরতা অসহ্য ছিল – তবু সমাজের ক্ষত – সমাজের যাবতীয় ব্যাধি অর্থাৎ সমাজ জীবনের অসুস্থতা দূর করার জন্য অর্ধাশন-অনশন স্বীকার করেছেন – অপমান সহ্য করেছেন – সেখানে সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণি তাঁকে পরাভূত করতে পারেনি – সেখানে তাঁর জয় সেখানে তিনি বিজয়।

সমাজ অন্তরের অসুরকে বধ করে সমাজ মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকে প্রতিষ্ঠা করতেচেয়েছেন ধর্মের নামে ধর্মহীনতা, ভন্ডামি, কূপমন্ডুকতা – এসবের বিরুদ্ধে সারাজীবন তিনি প্রতিবাদী গান রচনা করেছেন। চিন্তার-চেতনায় কু-অভ্যাস থেকে সাদারণ মানুশ যাতে মুক্তি পায়, শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে পারেন সেদিকেও সতর্ক করেছেন। যারা ধর্মের অভিনয় করে মানুষ ঠকায়, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সর্বদা তাদের সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন তার সঙ্গীত দর্শনেও ভন্ডদের বিরুদ্ধে সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন ---

"সবিনয় নিবেদন আমার, অভিনয় নয় ধর্মের রাস্তা,
শুধু মুখ ছুটালে ধর্ম মিলে, ধর্ম নয় ভাই আলুর বস্তা।
বাক্য যেথা নির্বাক হয়ে রয়, মননে হার মানে মনুরায়
কাজ না করে সাজ পরে তাই পাবে কি কথায়
আগে খুঁজে দেখো, গলদ কোথায়, করে লও তাই শায়েস্তা।"[২০]

সমাজের মধ্যে মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ, আনন্দরূপকে তিনি আবিষ্কারের জন্য আন্তরিক ভাবে আত্মা-নিবেদন করেছিলেন। তার এই অন্তর নিহিত মানবিক মননশীলতাকে আমরা খুঁজে পাই তার লেখা বিভিন্ন গানের মধ্যে। তিনি গভীর ভাবের ভাবুক এবং প্রবলভাবে ধর্মী ছিলেন। অনেক কর্মের মধ্যে বিজয় সরকার বিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহের আয়োজন করে তাদের জীবন-দুঃখ-জীবনযন্ত্রণা লাঘব করার জন্য বিদ্যাসাগরের পথে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলেন। এর জন্য তাঁকে বহু বাধার মধ্য দিয়ে অপমানে অসম্মানে অগ্রসর হতে হয়েছে। কিন্তু সেজন্য তিনি কখনো পশ্চাদ পদ হয়েছেন, উৎসাহ হারিয়েছেন-তা নয়, বরং তিনি অদম্য উৎসাহে - অফুরন্ত প্রাণের প্রবল বেগে পথ চলেছেন-কেবল মনুষ্যত্বের গৌরবের জন্য।

সমাজের অন্তর্গত যে অন্ধতা-ত্মসিকতা-জড়তা-জীর্ণতা-অসামাজিকতা-অমানবিকতার পরিচয় বহন করে-তা তাঁকে প্রত্যহ পীড়া দিয়েছে - দুঃখ দিয়েছে - ব্যাথা দিয়েছে সন্দেহে নেই - সেখানে তকে তা পরাভূত করতে পারেনি। এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় প্রতিমুহূর্তে জয়ী হয়েছেন। সমাজের মধ্যে যা কিছু ভালো, যা কিছু কল্যাণ তা যেমন তিনি দেখতে চেষ্টা করতেন, তেমনি তাকে রক্ষা করার জন্য তিনি যেন তার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়ে চেষ্টা করতেন।

সমাজের মধ্যে যে সত্যপদার্থ-সত্য সম্পদ তাকে যেমন খুঁজেছেন তেমনি সমাজের প্রায় সমস্ত অসামাজিক, অমানবিক আবরণ ভেদ করে সমাজের মর্মস্থলে পৌঁছে একেবারে মানুষের মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করতেন। এর জন্য সমাজের ভিতরকার অনেকে তাকে আক্রমণ করার, অসম্মান করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কখনো তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাদের অসম্মান করেননি, বরং তাদেরকে অন্তরের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে তাদের ভিতরকার সেই বড় মানুষকে সম্মান দিয়েছেন। তিনি তার জীবন-সাধনায় জেনেছিলেন মানুষকে অপমান করা, অসম্মান করা প্রকৃত অর্থে মানুষের ঈশ্বরকে খাটো করা। তিনি তার জীবদ্দশায় বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাদের ভালোবাসা গ্রহণ করেছেন।

তাঁর তীর্থ ছিল মানুষের হৃদয়। সেখানেই তিনি তীর্থ ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানে মনের গ্রন্থি মোচন করে মনুষ্যত্ব অর্জন করেছেন, আর মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্য আপনাকে সমাজের বলিকাঠে বলি দিয়েছেন-যেন এযুগের যীশু। এই জন্য সত্যব্রতী বিজয় সরকারের কাছে সংগ্রামের শক্তি ও তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে এবং তার জীবনদর্শনকে মনোরম করে জীবনে ফলবতি করে তুলতে হবে, নির্ভীক পৌরুষের সাথে পূর্ণশক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করতে হবে।

বিজয় সরকার সমাজের মনুষ্যত্বহীনতাকে গভীরভাবে প্রত্যখ করেছিলেন বলেই সমাজের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্বোধন করে চেয়েছেন, সামাজিকতার ও মানবিকতার সমগ্র কারুকার্যে। আজ বিজয় সরকার আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে সত্যভাবে লাভ করেছেন - আপনার মানবিক মনুষ্যত্বকে মিলিয়ে। তিনি জেনেছেন মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো। সেই জন্য তিনি মানুশকে অপমানিত না করে, মানুষের ধনকে, মানকে না দেখে - 'মানুষ অমৃতের পুত্র' এই বলে সমস্ত মানুষকে সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং দেশের ও দশের সেবায় আত্মদান করতে বলেছেন :

"দেশের সেবায় কর রে মন, কর আত্মদান,
তুমি কর্মমুখর জীবন গড়, সরস রেখে চিত্ত খান।।

নিজ স্বার্থে তুমি এ জীবন কাটাও
লোকে বলবে সাজের মানুষ কাজের কিছু নও,
যদি মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে চাও, কর দেশের কল্যাণ।।

দশের মঙ্গল করব ভবে এমনি যার স্বভাব,
ব্যক্তিগত জীবনেও তার থাকে না অভাব,
আর কত কি যে হয় বিষয় বৈভব, কে কবে তার বাখান।।

স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন এই দুনিয়া ভর,
দশের সেবা না করিলে, মিলে না ঈশ্বর,
মন রে সাধকের বাক্যে করে নির্ভর, ছাড় আত্মস্বার্থের টান।।

পাগল বিজয় বলে, বিশ্ব মাঝে দশের সেবক যে,

হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান পূজ্য সে,
ও সে অমরত্ব লাভ করে যে, পেয়ে দশের আশিস দান।।"[২১]

লোককবি বিজয় সরকারের রচিত গানগুলি পর্যালোচনা আরো দুটি উদ্দেশ্যমুখী নন্দন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুটি বিষয়ে মরমি কবি বিজয় সরকারের স্বকীয়তা স্পষ্ট। মুক্তমনা সাধক কবি মানেন মানুষের কোন জাত নেই। মানুষকে তাই তিনি সবার উপরে স্থান দিয়ে আন্তরিক আত্মীয়তায় প্রচার করেছেন। জাতি-ধর্ম, বিষয়ে তাঁর ধারণা খুব স্বচ্ছ ছিল। কারণ নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি জাতি-বর্ণ বিভেদের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-বাউল-ফকির-সহজিয়া কারুর মধ্যেই তিনি ভেদাভেদ করেন নি। তিনি মনে করেন, জন্মের পর মানুষ যে মৃত্যুপথে ধাবিত হয় - সেই পথ অভিন্ন। বিজয় সরকারের সাম্প্রদায়িক ব্যাপ্তবোধ ও মানবিক স্বচ্ছ ধারণা ও প্রয়োগ আমাদের সগর্ব সম্পদ। আমাদেরদেশের উচ্চবর্ণের মানুষেরা যখন ধর্মবোধে পরস্পর বিবাদমান, সংকীর্তন জাতি বর্ণে ও শ্রেণিতে উঁচু-নীচ বিভক্ত, তখন এই ভাববাদী সাধক মানুষটি উদারমুক্ত মানবিকতকে আশ্রয় করেযা লিখেছেন তার তুলনা নেই ---

।।এক।। 'জাতি বলতেকি বুঝলেপন্ডিত মশাই
দেখি জগতে এক মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত তাই।।'[২২]

।।দুই।। জাতি ভেদ মেনে হিন্দু দল, দিনের দিন গেল রসাতল।[২৩]

।।তিন।। "আল্লা-হরি-খোদা কিংবা বলে ভগবান
গড্ বলে কেউ, কেহ বলে পাথিয়ান",[২৪]

।।চার।। "কেহ হিন্দু কেহ মুসলমান, কেহ বৌদ্ধ ইহুদী খ্রিস্টান,
সৃষ্টির পানে দৃষ্টি দিয়ে স্রষ্টার প্রতি টান;
ইহার মুল নাই কিছু ব্যবধান, খুলে দেখ জ্ঞান নয়ন।।"[২৫]

।।পাঁচ।। "আমি জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি?
আমরা বহু নামে, ধরাধামে, কত রকমে ডাকি।"[২৬]

সাধারণ ভাবে 'জাত' শব্দের অর্থ হল : গোত্র, বংশ, প্রকার, গণ, বর্গ ইত্যাদি। তবে, 'জন্মেছে যে সে হল জাত; সেই জাত গতিশীল হলে তাকে বলে জাতি। ...কার্যত, একই রক্ত সম্পর্কের স্বজনদের জ্ঞাতি এবং তাঁদের ঘিরে সমস্ত পরিজনদের নিয়ে যে সার্বিক সত্তা তাদের জাতি রূপে শনাক্ত করা হয়ে থাকে।'[২৭]

বিজয় সরকার তাঁর এসব বাণীতে জাতি বিচারের প্রশ্নকে দৃঢ়তার সাথে অগ্রাহ্য করেছেন। বরং এসব গানে তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অখন্ড মানবতার কথা ব্যক্ত করেছেন। আর এই সমন্বয় চিন্তার মর্মকথা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এক শুদ্ধ সমাজ, সাম্য-মৈত্রীর সমাজ। তিনি নিজেকে উন্নীত করেছিলেন এ সব স্থুল ভাবনার ঊর্ধ্বে এক অভিন্ন মানবিকতা বোধে। তাই বিজয় গবেষক বলেছেন ---

"উচ্চবর্ণ কিম্বা নিম্নবর্ণ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবার
চাহিদা ও মানবিক স্ফূরণে বিজয় সরকার হিংসা বিদ্বেষ বর্জিত
অসাম্প্রদায়িক লৌকিক ধারায় বাংলা গান রচনা করেছেন।"[২৭]

লোককবি বিজয় সরকার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জ্ঞান হওয়া অবধি তিনি বর্ণবাদী সমাজ থেকে সারাজীবনই সূক্ষ্ম নির্যাতনের আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। মিথ্যা জাতিবর্ণ ভেদের প্রতিকার কারো কাছ থেকে তিনি পাননি। বর্ণভেদকে বিজয় জতির 'যাঁতাকল' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছ্যুঁৎ-স্পর্শ বা স্পর্শ দোষকে 'বিষমবিষ' মনে করেছেন। জাতির বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কবি ছিলেন বিদ্রোহী। মরমিয়া বাদী সাধক কবি, সহজিয়া জীবনমুখী সত্যদ্রষ্টা কবি মানুষকে সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছেন, জগত জীবনের সত্য স্বরূপকে মেলে ধরতে। মানুষকে মানুষ হিসাবে দাঁড় করাতে তারগানের বাণী মানুষের চেতনায় রোপণ করেছেন---

"সৃষ্টির পানে দৃষ্টি দিয়ে স্রষ্টার প্রতি টান;
ইহারমূলে নাই কোন ব্যবধান, খুলে দেখ জ্ঞান নয়ন।।"[২৮]

--তথাকথিত উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও শোষণের চাপে অপমানিত সামাজিক অবস্থানই নিম্নবর্ণের দলিত কবির সত্য দৃষ্টি ও স্বচ্ছ মানবিকতার জাগরণ ঘটিয়েছে।

কবীর জাতিতে জোলা, রুইদাস, শুক্লহংস ছিলেন জাতে ধোপা, দাদ্দু ছিলেন ধনুকর, রজ্জক ছিলেন কলাল, নামদেব জাতিতে ছিপী - এই সব মহান মানুষের জন্ম হয়েছে তথাকথিত নিম্নবর্গ-দলিত খেটে খাওয়া মানুষের ঘরে। কিন্তু তাঁদের উদার হৃদয় চেতনা, মানবিক স্বচ্ছ দৃষ্টি জীবনে মূল সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছে, মনুষ্যসৃষ্ট জাতিবর্ণ ধর্মের সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে দিয়ে জাগরণের জয়গান গেয়েছে। মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিবাদী হয়েছে। কবি বিজয় সরকার এই মহান মানুষেরই উত্তরাধিকারী। এখানে জাতিবর্ণ বিদ্বেষে বিদ্রোহী কবির একটি প্রাসঙ্গিক পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা যাক :

ধর্ম লয়ে মাতামাতি করে অনেকজন
কত হাতাহাতি করিয়ে যায় রাতারাতি বিসর্জন।।"[২৯]

--এই ভাবে তাঁর গানে ধর্ম-সমন্বয়, আচার সর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, মানবমহিমাবোধ, জাতিভেদ ও ছুঁতমার্গের প্রতি ঘৃণা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। মূলত তাঁর বিদ্রোহ চিরাচরিত শাস্ত্র আচার ও প্রচলিত সমাজধর্মের বিরুদ্ধে। বিজয় তাঁর আন্তরিক বোধ ও বিশ্বাসকে অকপটে তাঁর গানে প্রকাশ করেছেন। তাঁর আদর্শ জীবনাচরণের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কোনও অমিল হয়নি - বিরোধ বাধেনি কখনো। বিজয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যেও দেখা যায়।

সমন্বিত ধর্মন্বিত ধর্মচেতনা মধ্যযুগের মরমি সাধকদের যে ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, লালন সাঁইয়েও সেই চিন্তা ও প্রয়াস লক্ষণীয় যা পরবর্তীতে বিজয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। লালন অখন্ড মানবধর্মের জয়গান করেবলেছেন ---

'যে যা ভাবে সেই রূপে সে হয়।
রাম-রহিম-করিম-ক্লা এক আত্মা জগৎময়।'[৩০]

--জাত বিচারে সম্পর্কে মধ্যযুগের কবি তুলসী দাস বলেছিলেন---

"লোকেরা উত্তম-অধম বর্ণবিচারে করে জাতির গর্ব করে।
কিন্তু পরমেশ্বরের ভজন বিনা চারটি জাতিই চামার হিসাবে
গণ্য হয়।"[৩১]

--চেতনা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে বিজয় সরকার এঁদেরই যোগ্য উত্তরসূরি। তাই স্পষ্ট বলেছেন ---

"যে নামে জেনেছ যে জন সেই নামেতে ডাকো,
ধর্ম জেনে কর্ম মেনে সত্যের পথে থাকো,
হিন্দু-মুসলমান জাতি ধর্ম দরদী,
জৈন-শিখ-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, আরো জাতি ইহুদি,

সবার আসা যাওয়া একই বিধি বিধান দেখো।।

আল্লা-হরি হরি-খোদা কিংবা ভগবান,
গড্ বলে কেউ, কেহ তারেবলে পাথিয়ান।
যদি মর্মে থাকে ধর্মের ইমান, বিফল হয় নাকো।।"[৩২]

শ্রেণি বর্ণবিভক্ত ধর্মে আচার-শাসিত সমাজে ছুঁতমার্গ, অস্পৃশ্যতা অ জাতিভেদ যে প্রবল সামাজিক ও মানবিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, তার বিরুদ্ধে বিজয় সরকার সব সময়েই ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তাই বিশেষ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন তিনি :

"হিন্দুর এই হিংসাবিদ্বেষে, ছুঁতিস্পর্শ বিষয় বিষে,
জাতির জীবন বাঁচবে কিসে বসে বসে ভাবি তাই,
ঠুন্‌কো জাতি চরাচরে, আজ না হয় কাল ভাঙবে পরে,
পাগল বিজয় বলে বিষদ ভরে জাতিভেদের মুখে ছাই।।"[৩৩]

কিংবা

"ধর্ম লয়ে মাতামাতি করে অনেকজন
কত হাতাহাতি করিয়ে যায় রাতারাতি বিসর্জন।।"

জাতি বিচার সম্পর্কে গান বাঁধতে গিয়েবিজয় চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন---

"ব্রাহ্মণ ক্ষৈত্র বৈশ্য শূদ্র, চামার জাতির নাই বিচার
নিতাই চাঁদের হাটে গেলে, সব জাতি হয় একাকার।"[৩৪]

-বিজয় এই ভাবে জাতিভেদ ও ছুতমার্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে এসেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে অনেকবারই। এ-সব কারণেই হয়তো তাঁর ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠেছিল একটি প্রতিবাদী সত্তা। একজন কবি হিসাবে তিনি জানতেন, জাতের সীমাবদ্ধতা মানুষকে খন্ডিত ও কূপমন্ডুক করে রাখে। তাই জাত ধর্মের বিরুদ্ধে কবি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন ---

'জাতা-জাতির এই যাঁতাকল কেমনে এড়াব ভাই।'[৩৫]

মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ-বঞ্চনা-অবিচার চির অবসান কামনা করে বিজয় শ্রেণিহীন শোষণমুক্ত এক অভিনব আলোকিত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ব্যবধান বিজয় কখনও অনুমোদন করেননি। তাঁর আন্তরিক প্রত্যাশা ছিল ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতিহীন সাম্যশাসিত সমাজের। মানবাত্মার লাঞ্ছনায়, কাতর মানুষের দুর্দশা-দুঃখে ব্যথিত, মানবমুক্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুল বিজয়ের এই ব্যতিক্রমী উচ্চারণ তাঁকে অনায়াসে শোষিতজনের পরমবান্ধব সমাজমনস্ক এক অসধারণ মরমি-মনীষী হিসাবে চিহ্নিত করে।

কবি বিজয় সরকার বাঙালির জাতীয়তাবোধের উন্মেষে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর যেকোন দেশের যে কোন আন্দোলন, সন্ত্রাস বা বিপ্লবে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিল্পী দলের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। এক্ষেত্রে বিজয় সরকারও ব্যতিক্রম ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি স্বদেশ প্রেমিক। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট ভারত উপমহাদেশ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিখন্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করল। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিল। বঙ্গদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ পূর্বপাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হল। পাকিস্তান বাংলা ভাষাভাষি বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু পাকিস্তানের বাঙালি বিদ্বেষী বর্বর শাসক গোষ্ঠী জোর করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিল। সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিরা মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী আন্দোলনের

উপর বর্বর নৃশংস আক্রমণ হানল। ঢাকার রাজপথ বাঙালির রক্তে ভিজে গেল। জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালি প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুললেন।

কবি বিজয় সরকার মাতৃভাষা সম্মান রক্ষ জন্য আসরে আসরে গানের মাধ্যমে জনমত গঠন তাঁর বিরাট ও বিচিত্র কর্মজীবনের মধ্যেদেখা যায়। তাই বাঙালির ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা প্রেমী মানুষের মতো তিনি বুঝেছিলেন মাতৃভাষার সাবলীল বিকাশ ছাড়া মানবমনের মননশীলতা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই বাঙালি বিদ্বেষী পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক গান রচনা করেছেন এবং তা আসরে পরিবেশন করেছেন। পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান প্রভৃতি সকল বাঙালিরমধ্যে যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে লোককবি বিজয় সরকার ও অন্যান্য লোককবিগণ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লোকসাংবাদিকতার (Folk journalism) দৃষ্টিতে যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখব তিনি বাঙালির ঐ দুর্দিনে সঠিক লোক সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়াকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে তিনি গাইলেন :

"বাংলাদেশের মানুষে ফেব্রুয়ারী একুশে, ভুলিতে পারবে না জীবনে
ভাষা আন্দোলনের জন্য, জনসমাজ হল বিপন্ন
কুখ্যাত সরকারের শাসনে।।

বাংলাদেশের কি দুর্দশা, উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা,
কোনো আশা ভরসা দেখিনে;
মলিন হলে মাতৃভাষা জীবন বৃদ্ধি নাহি আশা
ব্যর্থ হয় আত্ম-উন্নয়নে।।

যে ভাষাকে দেখি স্বপন, যে ভাষাতেই কই মনের গোপন
স্মরণ মনন চলে যে ভাষণে,
যে ভাষায় জাতীয় কৃষ্টি, জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস সৃষ্টি
শনির দৃষ্টি পড়ল কুক্ষণে।।"[৩৬]

--বাংলাদেশের জাতীয়বাদী কবি বিজয় সরকার সেদিন যেগানগুলি রচনা করেছিলেন তার সাহিত্যিক মূল্যের পাশাপাশি ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। এছাড়া দেশবন্দনার গানে তাঁর গভীর আবেগ ফুটে উঠেছে---

* 'তুমি যে দেশে বাস কররে বন্ধু, সে দেশ যেন কতকই সুন্দর,'
* 'আমার পুরবের বাংলারে গরবের জন্মস্থান,'
*'মোদের বাংলাদেশ, সোনার বাংলা দেশ' - এমন উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

কবি বিজয় সরকার ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার জন্য তাঁকে সব সম্প্রদায়ের মানুষই ভালো বাসতেন। যখনই সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠত তখনই তিনি গানের আসরে সম্প্রীতির গান শোনাতেন এবং দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করতেন। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলের সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের বাণী তার গানে উঠে এসেছে সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবলীলাক্রমে। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরান তাঁর ছিলো কণ্ঠস্থ। যথার্থ উদ্ধৃতিতে মাতিয়ে দিতেন আসরকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এক মানবসমাজের অধিবাসী হয়ে উঠতো তাঁর মোহময় দরদি কণ্ঠে ও নিপুণ মরমি পরিবেশনে। বঙ্গ সংস্কৃতির সেতুবন্ধনে তিনি ছিলেন এক বিরল ও দক্ষ কারিগর। কাঁটাতার যন্ত্রের বিপরীতে রূপসী বাংলার ওপার - বাংলার সংস্কৃতির মিলন সেতু ও সূত্রধর।

প্রায় শতাব্দীব্যাপী তাঁরজীবন পরিক্রমা। উভয় বঙ্গের গ্রামগঞ্জে, গোটা ভারতবর্ষের ও আন্দামানের বিভিন্ন আসরে আমাদের শাস্ত্রের নির্যাসটুকু পৌঁছে দিয়েছেন আপামর জনসাধারণের দরবারে। আমাদের শাস্ত্র যা দিতে পারেনি সাধারণ মানুষকে তথাকথিত প্রাথিষ্ঠানিক শিক্ষিত মানুষ যা দিতে পারেনি সেই মূলবাণী প্রেম-ভালো(বাসা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানব প্রেমের বাণী তিনি পৌঁছে দিয়েছেন গ্রামগঞ্জে দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাংলার ঘরে ঘরে। যথার্থ মানব প্রেমের তরী ভিড়িয়েছেন মানব সংসারের তীরে মানবতীর্থে। তিনি মানবতীর্থের এক অভ্রান্ত যাত্রী।

তিনি জন্মেছিলেন সত্যের সুধা নিয়ে। চারিদিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে - তাতে তাঁর বিতৃষ্ণা। তিনি চাইলেন সেই অনন্ত আশ্রয় যেখানে দিনরাত অনন্ত অমৃতের উৎস, সেখানে সকল মানুষের মিলন-তীর্থ। সমবায় ধর্ম মানুষের শ্রেষ্ঠ এই সত্য অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করলেন এবং বললেন ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয় - ঐক্যের শিথিলতায় মানুষ ব্যর্থ হয়। মানুষ নির্বিশেষে মানুষকে পৃথক করে জানার যেবুদ্ধি তা অহংয়ের বুদ্ধি, অপ্রেমের বুদ্ধি। এই বুদ্ধি আমাদের পরস্পরকে পৃথক করেছে - গতীহীন করেছে, অন্ধকারে আবদ্ধ করেছে। এই কথা বিজয় সরকার তাঁর সামাজিক জীবনের মধ্যে যেমন করে বুঝিয়েছিলেন, তেমনটি তাঁর সমকালীন সমাজের মধ্যে তেমন করে আর সমাজের বহুজন সংকীর্ণ অহমিকায় অবজ্ঞা করেছে, আপন বলে অস্বীকার করেছে - কিন্তু চিরকাল তিনি গভীর আন্তরে অস্বীকার করেছেন এই সকল অশুভ শক্তিকে। তিনি সমাজের মধ্যেকার মনুষ্যত্বের দুর্গতি দেখে, সমাজদেহের অস্বাস্থ্য দেখে অশ্রুপাত করেছেন। অনুভব করেছেন - মনের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই, বাইরের দিক থেকে সে কখনো স্বাধীন হতে পারে না। অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য - স্বাধীনতার স্বাদকে আগে অন্তরের মধ্যে অনুভবের আহ্বান জানালেন। তিনি বুঝেছিলেন সমাজ দেহের স্বাস্থ্যতত্ত্বই সমাজদেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য।

তিনি দেখেছিলেন, মানুষ কী ভাবে মৃত্যুর গহনে অবতরণ করছে - কী ভাবে স্খলিত পদে মৃত্যুর মুখের দিকে চলছে - মহামানবের সগরতীর থেকে। তিনি দেখেছেন, আমরা যেখানে মানবত্বকে অস্বীকার করেছি, সেখানেয়ামাদের অপমান - সেখনে আমাদের অসম্মান। এই মূঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন, সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে প্রতিপদে অস্বীকার করেছেন, আর অন্তরের মধ্যে শপথ করেছেন - অমানবিকতার চাপে আর সমাজ মানুষকে অপমানিত হতে দেবেন না। অর্থাৎ সমাজ মধ্যগত মানুষের আত্মাকে মানুষের দ্বারা অপমানিত হতে না দিয়ে, তাকে উচ্চ মানবিকতার একটা বিজয় মহত্বে মানব-সমাজের মধ্যে দাঁড় করাতে চেয়েছেন চিরকাল।

সমাজের মধ্যে যেবিচিত্র অসংলগ্নতা ও পরস্পরবিরুদ্ধতা রয়েছে তারপসারণেমানুষ বিজয় সরকার আপনার সৃষ্টিতেয়াপনাকে পেয়েছে এবং আপনাকে দিয়েছে। এই দান করার মধ্য দিয়ে তিনি সর্বকাল এবং সর্বজনের মধ্যে নিত্য হয়ে আছেন। অর্থাৎ তিনি বাঙালির জাতীয়তাবোধ সমাজের সমস্ত দিয়ে, জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। সেই কাজে তিনি কথখানি সার্থক হয়েছেন সেওকথা গণবেদবেত্তারা বলবেন। সকল মানুষে সমান অধিকার মানুষে-ঈস্বর পরম ঐক্য-এই মানবিক মন্ত্র যখন তিনি মানুষের হৃদয়ে দান করলেন তখন তাঁর সাধনার সম্পদ সমাজের সকল মানুষের উৎসবের যোগ্য হল। অমানবিক প্রবৃত্তি বিভেদ শুভবুদ্ধিকে খন্ডিত করেমানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ ঘটায়, বিদ্বেষের বিষ ছড়ায় - কেননা ভেদ-বিচ্ছেদ মানুষের অহং এরমধ্যে। তিনি দেখছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই ভেদ মানুষে-মানুষে, সমাজে-সমাজে শান্তি না এনে বিরাট বিরোধ জাগিয়েছে; ঐক্য বিধান করেনি, তাকে শতধা বিভক্ত করে তার বল-বুদ্ধি হরণ করেছে পাশবিকতার নির্মমতায়-নিষ্ঠুরতায়। মানুষ বিজয় সরকার বুঝেছিলেন, মানুষের পরমসত্য হচ্ছে সমাজের - সমাজ-সংসারের সমস্ত মানুষ এক; এই সত্যকে ব্যাপক ও ব্যবহারিক করে প্রাণের গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর কাজ। মানবিক আত্মার দৃষ্টিতে সকল মানুষকে দেখেছেন এবং মানবিক আত্মার যোগে সকল মানুষকে আত্মীয়-সম্বন্ধে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও গভীর ভাবে বুঝেছিলেন মানবিকতার মধ্যে মানুষের শান্তি, মানুষের কল্যাণ-যা একান্তভাবে সমাজের, সমাজের মানুষের।

বিজয়কে সকলে স্বীকার করবেন না এবং অনেকে তাঁকে বিরুদ্ধতার দ্বারা আঘাত করবেন। কারণ তিনি যে জাতি-ধর্ম-বর্ণের দিক থেকে নিম্নসমাজের একজন। কিন্তু জীবনে যাঁরা অমৃতলাভ করছেন, শত প্রতিকূলতার সামগ্রিক কুহেলিকায় তাঁদের জীবনদীপ্তিকেগ্রাস করতে পারেনা। তাই যাঁদের মনে মানবিক মানসিকতা সমুজ্জ, তাঁরা তাঁকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবেন। তাঁর কর্মকাজের মধ্যে দেখতে পাবেন বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যতত্ত্বের আশ্রয় এবং দেখতে পাবেন অমৃতরূপকে, আনন্দরূপকে। তিনি পাপের মধ্যে পবিত্রতাকে দেখেন, অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে, অশিবের মধ্যে শিবকে এবং মন্দের মধ্যে ভালোকে দেখেন; কারণ তাঁর ছিল অন্তর সত্যের দৃষ্টি।

তিনি চাইতেন মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরেমানবাত্মার জয় ঘোষণা হোক। মানুষ অন্তরের সম্পদেমহৎ হোক। কেননা, অন্তরের শত্রু সকলের চেয়ে বড়ো। তাই অন্তরের শত্রুকে মানুষ আগে জয় করুক – এটা তিনি মনে প্রাণে চাইতেন। মন্তহীন মানুষ অন্তরের স্বাধীনতায় মুক্তি পাক, অন্ত্যজ মানুষ অন্তরের সত্যে অন্তরগত অরাজকতা দূর করে অন্তরের ধর্মকে বড়ো করে তুলুক যাতে মানুষের সাথে মানুশের আত্মার মিলন ঘটতে পারে। তিনি জানেন, বিষয়বুদ্ধিতে, স্বার্থবুদ্ধিতে মানুষ তার অহংকার-হিংসা-বিদ্বেষ জাগিয়ে পৃথিবীকে-সমাজকে রক্তে পঙ্কিল করেছে; মানুষের মানবিক বুদ্ধিকে খর্ব করেছে। এইখানে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত সমাজ বিবেক উদ্ধৃত করা ভীষণ আবশ্যক :

> "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। ... ...
> সবারে না যদি ডাকো, এখন সরিয়া থাকো
> আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান
> মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।"[৩৭]

আজ সাম্প্রদ্যিক খন্ডচেতনা, ভোগবাদ আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে শুধু বিপন্ন করছে না – আমাদের অস্তিত্বের সঙ্কট ডেকে আনছে। সুস্থ-সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি ও সমাজ মানবতাবাদই পারে – একমুখী সমৃদ্ধশালী পৃথিবী গড়ে তুলতে। লোককবি বিজয় সরকার সারাজীবনব্যাপী সেই সংগ্রামের এক নির্ভীক যোদ্ধা ও অভ্রান্ত দিশারী। বিজয়ের গান সমাজ সম্পর্কের ধারা বেয়ে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ-ছুঁতমার্গ ইত্যাদি যুগ-সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছে। এই প্রয়াসের মাধ্যমে বিজয় সরকার সমাজচেতন ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় দিয়েছেন, তার স্বরূপ-নির্ণয়, বাঙালির প্রবহমান জীবনচর্চার মৌল নির্দেশক বলেই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

তথ্যসূত্র :

১। www.goodreads.com
২। বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র ও আরও অনেকে (সম্পা) : 'সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান,' সপ্তদশ মুদ্রণ, সাহিত্য কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৬৭
৩। ম্যাকাইভার, এম. আর. ও পেজ, এইচ. চার্লস : "সোসাইটি", 'সোসাইটি : অ্যান্ড ইন্টডাক্টরি অ্যানালিসিস', পুনমুর্দ্রণ, লন্ডন, ম্যাকমিলান, ১৯৬৯, পৃঃ ৫
৪। গোস্বামী, উৎপল (সম্পাদনা) : সঙ্গীতের মূল্যায়ন বক্তৃতামালা, তৃতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ – ১৯৯২, পৃঃ ২৪
৫। তদেব : পৃঃ ২১
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : লোকসাহিত্য, কবি সঙ্গীত, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, কামিনী প্রকাশনালয় কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ১০৩১
৭। মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ : গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃঃ ২৯
৮। চন্দ, পুলক : গণকবিয়াল রমেশশীল ও তাঁর গান, কলকাতা : কথাশিল্প, ১৯৭৮, পৃঃ ৮

৯। তদেব : পৃঃ ৮
১০। তদেব : পৃঃ ৮
১১। তদেব : পৃঃ ১৪
১২। চন্দ, পুলক : গণকবিয়াল রমেশশীল ও তাঁর গান, কলকাতা : কথাশিল্প, ১৯৭৮, পৃঃ ১৫
১৩। তদেব : পৃঃ ১৫
১৪। তদেব : পৃঃ ১৫
১৫। তদেব : পৃঃ ১৫
১৬। তদেব : পৃঃ ১৬
১৭। সিংহ, চন্দ্র ড. দীনেশ : পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৯২
১৮। মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন : 'রেনেসাঁস ও বাংলা সাহিত্য', প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পা), ২য় সং, রত্নাবলী, কলকাতা, মার্চ ২০০৬, পৃঃ ১৩৩১
১৯। পোদ্দার, অরবিন্দ : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ২৫৮
২০। বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রনাথ (প্রকাশক) : বিজয়গীতি, কেউটিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৬, পৃঃ ১৩৩
২১। তদেব, পৃঃ ২৭৬
২২। তদেব, পৃঃ ৩৮
২৩। তদেব, পৃঃ ৩৮
২৪। খান, কলিম ও চক্রবর্তী, রবি যৌথ সম্পাদনা, : 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ', ১ম সং কলকাতা, ভাষাবিন্যাস, আশ্বিন ১৪১৬, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০১-৪০২
২৫। তদেব, পৃঃ ৩৭
২৬। তদেব, পৃঃ ১৭৮
২৭। তদেব, পৃঃ ১৮৭
২৮। হোসাইন, মহসীন : বিজয় সরকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮
২৯। তদেব, পৃঃ ১৭৮
৩০। চৌধুরী, আহসান আবুল : লালন সাঁই, গাঙচিল, কলকাতা - ২০১১, পৃঃ ৬২
৩১। তদেব : পৃঃ ৬৩
৩২। তদেব, পৃঃ ৩৭
৩৩। তদেব, পৃঃ ৩৮
৩৪। তদেব, পৃঃ ৩৮
৩৫। তদেব, পৃঃ ৩৮
৩৬। তদেব, পৃঃ ১২
৩৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সঞ্চয়িতা, অপমানিত কবিতা, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ - ১৪১৮, পৃঃ ৩৮১